OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 127
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1018 - 1027
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 1018 - 1027
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালির বর্ণ ও জাতি পরিচয়গত দ্বন্দ্ব : নানা পরিসর

সৌরভ দাস
গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sourav.nobitadas2@gmail.com
0009-0009-2303-8566

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, পি ভি কানে, মেডিকেল কলেজ, নবধা লক্ষণ, বাবু সংস্কৃতি, নতুন বর্ণ-কাঠামো।

Abstract

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালির জাতি ও বর্ণ-কাঠামো নিয়ে নতুন করে চিন্তা শুরু হয়। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন পুরনো শাস্ত্রের কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটায়। জাতি ও বর্ণ দুটি পৃথক ধারণা থেকে নির্ণিত হলেও এ সময়ে সে নিয়ে প্রবল দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। জাতি ব্যবস্থা বৃত্তি অনুসারী ছিল বৃত্তির বদল জাতির পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। অন্যদিকে বর্ণ কাঠামো ছিল স্মৃতি অনুসারী। বাঙ্গীয় স্মৃতিকার রঘুনন্দনের মতে বাংলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া কোনো জাতির অস্তিত্ব নেই। কিন্তু জাতি ব্যবস্থায় জলচল ও জল-অচলের ভেদাভেদ ছিল। উনিশ শতকের শুরুতে অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে অনেক জাতিই তুলনায় উচ্চ জাতিত্বের দাবি জানায়। ফলে শুরু হয় শাস্ত্রীয় সংঘাত। বাংলায় তখনও পর্যন্ত কর্মবাদ ছিল প্রবল। ফলে শাস্ত্রীয় আচারের জটিলতায় এই দ্বন্দ্ব ধর্ম-ব্যবস্থার সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল। অন্যদিকে, উপযোগবাদী ইউরোপীয়দের চিন্তায় শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন সে সময়ে বাঙালির চিরায়ত বৃত্তি কাঠামোকে নাড়িয়ে দেয়। তাতেও নিজেদের প্রাধান্য ও আভিজাত্য প্রমাণ করতে কিছু জাতি মরীয়া হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিই উনিশ শতকের বাঙালিকে আধুনিক চিন্তার দিকে কিছুটা প্রগতি এনে দেয়।

মূলত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব শাস্ত্রীয় ও লৌকিক তর্ক-বিতর্কের জন্ম দেয়। বিবিধ ব্যবস্থাপত্র ও সংবাদপত্রের আলোচনায় উঠে আসে এরকমই অনেক তথ্য। সেই তথ্যগত জটিলতার সূত্রকেই নানাভাবে এই আলোচনায় আমরা তুলে আনার চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে দিয়ে আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি সমকালীন চিন্তাগত এই জটিলতা বাঙালিকে কীভাবে ধাক্কা দিয়েছে এবং সেই জটিলতার সূত্র কীভাবে আধুনিক বাঙালিকে অগ্রগতি দিয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি মূলত ব্রাহ্মণদের মধ্যে জাতি-বর্ণ ঘটিত বিবাদের অংশটিকেই। যদিও সে সূত্রেও আলোচনায় এসেছে অন্যান্য জাতি পরিসরের বৃত্তান্ত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 127
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1018 - 1027
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে বাংলার সমাজ কাঠামোর খোলনলচেটিকেও আঘাত করেছিল। সে সময়ে মোটামুটি নব্বই শতাংশ বাঙালির আয় হত কৃষিকে কেন্দ্র করে। শহরবাসীর সংখ্যা মোটে তিন শতাংশ। ফলে জমির চাহিদা ছিলই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির বিলি-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এক নতুন শ্রেণির জমিদাররা উঠে আসেন -- ঐতিহ্যগতভাবে যারা জমিদার ছিলেন না। সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, শিল্পমালিক, ইজারাদার, আইনজীবী ইত্যাদি অন্যান্য বিভিন্ন পেশার মানুষ মিলিয়ে এক মিশ্র জমিদার শ্রেণি তৈরি হয়। এরা রায়তদের সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগাযোগ না রেখে বহুস্তরীয় পত্তনিদারদের দিয়ে খাজনা আদায় করত। ফলে আবশ্যিকভাবে একশ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী তৈরি হয়। অন্যদিকে পুরনো জমিদারদের জমি ক্রমাগতই নিলাম বা ক্রোক হয়ে যাওয়ায় সংস্কৃতির কাঠামোও ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে বাংলার কুটির শিল্পের পতনে নতুন পেশা নিতে বাধ্য হওয়া বাঙালির কাছে পুরাতন কাঠামোয় মানিয়ে নিতে গিয়ে নানা সমাজ-দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ক্ষমতার মৌলিক একক অর্থনীতি হওয়ায় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণ হস্তান্তরিত হয় নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে। যেহেতু ঐতিহ্যগতভাবে তাদের সংস্কৃতির জ্ঞান ছিল নাফলে শিল্প-সাহিত্যে স্থূল রসের চর্চা বেড়ে যায়। সে সঙ্গে জাতিগতভাবে সকলে এক শ্রেণির না হওয়ায় এবং বাংলায় জাতি-কাঠামো নির্দিষ্টভাবে বর্ণানুক্রমিক না হওয়ায় আপাত নিম্নস্তরের জাতি উচ্চমর্যাদার বর্ণের গোত্রে অনুপ্রবিষ্ট হতে চায় ফলে সামাজিক সংঘাত অবধারিত হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে ইভেঞ্জেলিক্যাল আদর্শ বা উপযোগবাদী চিন্তার কারণে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের নানাস্তরের কাঠামোকে বদলে ফেলতে চায়। আগেই আমরা দেখেছি এসব ক্ষেত্রে প্রাচীন স্মৃতি বা তন্ত্রের প্রমাণ তাদের অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রেও এই নতুন শ্রেণি নিজেদের মর্যাদা রক্ষার তাগিদে সেই অস্ত্রের প্রমাণেই নানা সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে সায় দেয়। সেদিক থেকে বঙ্গীয় স্মৃতি বা কুলজির সাক্ষ্য কোনঠাসা হতে থাকলে যজন-যাজন-অধ্যাপনাজীবী ব্রাহ্মণরা (চিকিৎসার ক্ষেত্রে বৈদ্যরা) তাদের ধারাবাহিক কাঠামো থেকেই যুক্তি সাজাতে থাকে— যেহেতু তাদের পেশা ও কাঠামো জড়িয়ে ছিল প্রচলিত কাঠামোর সঙ্গে। সমাজ-দ্বন্দ্ব আলোচনার ক্ষেত্রে তাই জাতিগত ছক ও তার পরিবর্তিত অবস্থানের দ্বন্দ্বটিকে আগে আলোচনা করেই আমরা অন্যান্য পরিবর্তনের দিকে আলোকপাত করব।

বর্ণ ও জাতি পরিচয়গত দ্বন্দ্ব : হিন্দুদের বর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল সাধারণত গুণকে মাথায় রেখেই। ব্রাহ্মণরা সত্ত্বঃগুণ প্রধান, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গুণ যথাক্রমে রজঃ ও তমঃ। অন্যদিকে শূদ্রের এই গুণগুলির কোনোটাই নেই। আর অন্ত্যজরা বর্ণ-কাঠামোর বাইরে অবস্থিত। প্রতিটি বর্ণের শ্রেণিভাগ হত বৃত্তির ভিত্তিতে। বৃত্তির গুণে তাদের বর্ণ নির্দিষ্ট হত। প্রাথমিক স্তরে এগুলো কিছুই জন্মগত ছিল না। ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণ হয়েছেন (উল্টোটাও) বা বৈশ্য শূদ্র রাজা পরবর্তীতে ক্ষত্রিয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এরকম প্রমাণ পুরাণ বা ইতিহাসের সাক্ষ্যে মেলে। মনে রাখতে হবে অনার্যদের আর্য কাঠামোয় আত্মভূতকরণ শুরুর সময় থেকেই চলে এসেছিল— সেখান থেকে ক্রমাগত বর্ণ-সাংকর্য্যের ফলে জাতি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। জাতি কাঠামো জন্মগত। কানে জাতি ও বর্ণের পার্থক্য টেনে বলেছিলেন—

> "The ideal of varna even in the smrtis lays far more emphasis on duties, on a high standard of effort for the community or society rather than on the on the rights and privileges of birth. The system of jatis (castes) lays all emphasis on birth and heredity and tends to create the mentality of clinging to privileges without trying to fulfil the obligations corresponding to such privileges."[১]

প্রথমে অনুলোম ও পরে প্রতিলোম বিবাহ সমাজস্বীকৃতির সঙ্গে এই জাতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। পুরাণ বা মহাকাব্যে এই বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। ফলে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রেও বিষয়টি গৃহীত হয়। জাতিগুলির উচ্চ-নিচ ভেদকরণের মধ্যে পদমর্যাদা ও পেশার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা জড়িয়ে ছিল বলে মতামত দিয়েছেন অনেকেই।[২] সাধারণত মানুষ তাদের বর্ণবৃত্তি অনুসরণ করলেও, উল্টোটাও যে হত এ কথা বলাই বাহুল্য।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 127
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1018 - 1027
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ক) ব্রাহ্মণদের মধ্যে স্বজাতি রক্ষার্থে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ঘটিত দ্বন্দ্ব : বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় অন্তত গুপ্ত আমল থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণ কাঠামো অনুসৃত হয়ে এসেছে। পাল-চন্দ্র শাসন-পর্বে এই কাঠামোয় কিছুটা ঔদার্য লক্ষ করা গেলেও সেন-বর্মণ পর্বে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় থেকেই বাংলার নিজস্ব স্মৃতিশাস্ত্রকারদের পাওয়া যায়। পালযুগের শেষের দিকে ভবদেব ভট্ট থেকে ক্রমে হলায়ুধ, বল্লাল সেন, অনিরুদ্ধ ভট্ট বা জীমূতবাহনকে পাওয়া যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি, রঘুনন্দন পর্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্রের বিস্তার। এই সমস্ত স্মৃতিকারের গ্রন্থ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ-ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বল্লালচরিত থেকে বাঙালির জাতি-কাঠামোর ছকটা স্পষ্ট করে বোঝা যায়। বাংলায় বর্ণ ভাগের পরিবর্তে জাতিভাগই লক্ষ করা যায়। বাংলায় মূল ৩৬টি জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণও জাতি হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লিখিত সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায় ব্রাহ্মণ ছাড়া সকল জাতিই শূদ্রবর্ণভুক্ত। স্মৃতিশাস্ত্রে গুপ্তযুগ থেকেই ব্রাহ্মণদের গাঞি পরিচয় পাওয়া যায়। করণ-কায়স্থ, বৈদ্য-অম্বষ্ঠ, কৈবর্ত ইত্যাদি জাতিও তখন স্বীকৃত ছিল। অনিরুদ্ধ বা হলায়ুধ বাংলায় বেদচর্চার দুরাবস্থা দেখে হতাশ হয়েছিলেন। সেন আমলেই বাংলায় বেদ-চর্চা বাবদ স্মৃতির চর্চা শুরু হয়। জাতি গঠনের ক্ষেত্রে মূলত ব্রাহ্মণদের মৌলিক একক ধরে[৩] তাদের সঙ্গে অন্যান্য জাতির সামাজিক সম্পর্কের ধরনের নিরিখে সৎ-অসৎ শূদ্র বা উত্তম-মধ্যম-অধম সংকর বা জলচল-জল অচল ইত্যাদি ভাগে ৩৬টি জাতিতে (বৃহদ্ধর্ম পুরাণে জাতির সংখ্যা ৪১) ভাগ করা হয়। উক্ত ভাগের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পর্যায়ে জাতিগুলির উন্নতি-অবনতি চলতে থাকে। ব্রাহ্মণদেরও রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, শ্রোত্রিয়,[৪] গ্রহবিপ্র হিসেবে কুলীনত্বের ভিত্তিতে (৯টি গুণ) ভাগ করা হয়। সেখানেও অন্যান্য জাতির সঙ্গে মেলামেশায় জতিভ্রষ্ট হওয়ার ব্যাপার ছিল। যেমন - এ সময়ে সুবর্ণবণিকদের অর্থ থাকা সত্ত্বেও মধ্যম-সংকর শ্রেণিতে চ্যুতি ঘটে।[৫] একইভাবে মাহিষ্য-মালাকার-কুম্ভকার-কর্মকার প্রভৃতি জাতি উত্তম-সংকর পর্যায়ে উন্নীত হয়। সাধারণত সমাজে মধ্যবিত্তরা সৎ-শূদ্র এবং শ্রমিকেরা অসৎ-শূদ্র বা অন্ত্যজ পর্যায়েই স্থিত ছিল। বৃত্তি ও অর্থনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রম-বিবর্তন চলতেই থাকে। ইসলামি শাসন-পর্বে ক্রমেই ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্র অনমনীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। হিন্দু সমাজে উঁচু জাতি হিসেবে থাকতে পারার সঙ্গে আভিজাত্যবোধ তৈরি হয়। কিন্তু জাতি নিয়ে দ্বান্দ্বিকতা শেষ হয়নি। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যের কুলজিগ্রন্থগুলি অনৈতিহাসিক তথ্যে ভরা হলেও— তা থেকে এই বাঙালি হিন্দু সমাজে জাতি নিয়ে নানান বিরোধী মতামত যে ছিলোই তা বোঝা যায়। প্রথমদিকে কুলজিগুলি পারিবারিকভাবে লেখা হলেও পরে বল্লাল সেনের কুলবিধি-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কুলাচার্য্যরাই কুলের সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করত। কুলাচার্য্য নিয়োগের ফলে কুলীনদের (ব্রাহ্মণ-কায়স্থ) দেখাদেখি অকুলীনরাও এই ব্যবস্থাতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরেও, নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন—

> "—পাছে কোন কাজে দোষ বাহির হইয়া পড়ে—পাছে তাহা প্রস্তররেখাবৎ চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় সকলেই বিশেষ সতর্ক হইলেন, এমন কি, অনেকেই কুলাচার্য্যের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িলেন। ...একদিন তাঁহারাই সমাজের নিয়ামক ও ভাগ্যবিধাতা হইয়া পড়িয়াছিলেন।"[৬]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-কাঠামোয় আভিজাত্য শক্ত হয়ে বসে। তেমন তারাই নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলে অন্যান্যদের জাতিনষ্ট করেছে (যেমন-- কায়স্থের শূদ্রারোপ) বলে নগেন্দ্রবাবু মন্তব্য করেছেন। এর প্রমাণ যাইহোক এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বাঙালি হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-কাঠামোর কঠোর শৃঙ্খলা এবং তা থেকে পদচ্যুতি অনেক জাতিরই ঘটছিল। সে সঙ্গেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৌলীন্য ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা কেবল বংশ-মর্যাদার গুণে উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়ে। অন্যদিকে হোসেনশাহি বংশের পর থেকেই বাংলায় বহির্বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং মুঘল শাসনকালে নতুন জমিদার-শ্রেণির উদ্ভবের ফলে বাংলার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। তখন জমিকে ভিত্তি করে থাকা জাতি এবং কায়স্থ-বৈদ্যের[৭] মত চাকুরিজীবী বা ব্যবহারিক শ্রম স্বীকার করা জাতিরা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল অবস্থানে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের বৃত্তি যজন-যাজন-অধ্যাপনার মধ্যে আবদ্ধ থাকায় অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে— কেবল ফাঁপা আভিজাত্যের গৌরবই তাদের টিকে থাকে। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশি বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্যের সূত্রে বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত জাতিগুলির আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়ে। ফলে গৃহস্থ হিন্দু বাঙালি অর্থাৎ স্মার্ত কাঠামো অনুসরণকারী বাঙালির জাতিভেদের আলগা কাঠামোকে উনিশ শতকের নতুন চিন্তা আন্দোলিত করে। শুরু হয় বর্ণ ও জাতি কাঠামো নিয়ে দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 127
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1018 - 1027
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রবর্তন করেছিলেন মূলত ইংরেজের রাজস্ব বাড়ানোর অভিপ্রায়ে। সে সঙ্গে আরো একটি লক্ষ্য ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর জমিদারদের অমিতব্যয়িতা রুখে দক্ষ-উপযুক্ত জমিদার গঠন করা এবং জমিদারদের সঙ্গে রায়তের সুসম্পর্ক গঠন করা। কিন্তু মোট ভূমি রাজস্বের ৯০ শতাংশ রাজস্ব ধার্য করায় অনেক জমিদারই তা দিতে অক্ষম হন। ফলে 'Sale Law'-এর নিয়মে পুরনো জমিদারদের জমি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম কুড়ি বছরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জমিদারি হস্তান্তরিত হয়।[৮] এ সময়ে বাংলার বড়ো বড়ো জমিদারি যেমন নাটোর, রাজশাহী, নদীয়া, বীরভূম, দিনাজপুর, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি নিলামে বিক্রি হয়। সে সব কিনে নিতে সক্ষম হন বণিক, ব্যাবসায়ী, শিল্পমালিক আইনজীবী বা ইজারাদার-গোমস্তারা। এই নতুন জমিদারতন্ত্রে খাঁ, দেব, সিংহ, পালচৌধুরী, ঘোষাল, ঠাকুর ইত্যাদি বিচিত্র জাতির মানুষেরা জমিদার হন। অন্যদিকে, কুটিরশিল্প বা বাণিজ্য বিদেশি কোম্পানির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জমির চাহিদা বাড়ার কারণে এ সমস্ত বৃত্তিজীবী শ্রমিকেরা কৃষিবৃত্তিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এমনকি অশিক্ষিত ব্রাহ্মণেরাও পুরোহিত, ঘটক, পাচক ইত্যাদি বৃত্তি গ্রহণ করে।[৯] অর্থাৎ সমস্ত জাতিই কৌলিকবৃত্তি ছেড়ে লাভজনক কোনো বৃত্তি অবলম্বন করে। ফলে বাংলার জাতি-বর্ণের স্মার্ত কাঠামোটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

কুলীন হতে গেলে নবধা লক্ষণকে পূরণ করতে হত।

"আচার বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনাম্,/ নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল-লক্ষণম্।"[১০]

কৌলীন্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল শুভকরী উক্ত গুণগুলির সমাজে ব্যাপ্তিদান। যেহেতু কুলীনরা নিম্নস্তরের জাতির মেয়েদের বিয়ে করতে পারত, তা থেকে কুলীনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে গুণগুলি আরো ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু কৌলীন্যের আভিজাত্য বংশগত হওয়ায় তা কূপমণ্ডুকতায় পর্যবসিত হয়।[১১] উনিশ শতকের শুরুতে জাতির কাঠামো অর্থনৈতিক কারণে বিপর্যস্ত কৌলীন্যের বদলে আভিজাত্যের সূচক হয় বাবু-সংস্কৃতি। বাবুদেরও নবধা লক্ষণে চিহ্নিত করা শুরু হয়—

"ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মণিয়া গান। অষ্টাহে বন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।"[১২]

আভিজাত্যের আপাত কাঠামোটি এক থাকলেও অন্তর্গত সূত্রগুলি বদলে গেল। ভোগ-বিলাস-ব্যসনই হল আভিজাত্যের নবধা লক্ষণ। এই লক্ষণ ভবানীচরণের নববাবুবিলাস-এর অনেক আগেই নির্মিত ছিল। ১৮২১এর ২৪ ফেব্রুয়ারি 'সমাচার দর্পণ'-এ অন্তত এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ উনিশ শতকের শুরু থেকেই কৌলীন্যের ছকে আভিজাত্য হিসেবে অর্থ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল। বাবুর উপাখ্যান নামক দর্পণে প্রকাশিত নক্সাজাতীয় আখ্যানটিতে একজন ধনী কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্রের বাবুয়ানির নানা দিককে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর জন্মানোর পরে কুলাচার্য্য[১৩] সদ্যপ্রসূত বাবুর মধ্যে নবগুণের লক্ষণ দেখেছিলেন। কিন্তু পরে অন্য একজন (বিদ্যালঙ্কার) কৌলীন্যের নবগুণের বদলে বাবুদের ন'টা গুণ দেখা যাচ্ছে বলে বলেছে – 'কর্ম্মানুযায়ি নাম আর দেখি না', অর্থাৎ বিত্তের হিসেবে ব্রাহ্মণ নাম নয়, বদলে বাবু নাম রাখতে বলেছে। তৃতীয়ের ভাষায়—

"আপনকার এত ঐশ্বর্য্যে এ সন্তান হইয়াছেন ইনি বাবু হইবেন অত্র সন্দেহোনাস্তি..."[১৪]

অর্থাৎ বাবু হওয়া গৌরবের ব্যাপার, সে ক্ষেত্রে কুলাচার্য্যদের মতামতটা নিয়ে তিলকচন্দ্র নাম রাখলেও বাবুটা লেজুড়ের মতো জুড়ে দেওয়া হয়। সমাজ-নিয়ন্ত্রণে কুলাচার্য্যের একচেটিয়া আধিপত্য যে থাকছে না— ঘটনাটা তাই প্রমাণ করে। অন্যদিকে কর্মানুযায়ী নামের বদলে 'মধুমক্ষিকার চাকনাশক বাবু' অর্থাৎ ভোগ-বাসনার প্রতীকী নামই স্বীকৃত হল। যদিও আখ্যানটি ব্যঙ্গাত্মক— ফলে ন'টা লক্ষণের ছক উপহাসের ছলে বলা হলেও— এর মধ্যে আভিজাত্যের কাঠামোর হেরফেরের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে।

উক্ত পত্রিকাতেই ৩০ জুন প্রকাশিত 'বৃদ্ধের বিবাহ' নামে উপাখ্যানটিতে বিপত্নিক দক্ষিণ-দেশীয় (রাঢ়ীয়) বিপত্নিক বৃদ্ধের সঙ্গে উনিশ বছরের অবীরা কুলীনের মেয়ের বিয়েতে ৫০০ টাকা কন্যাপণ দিয়ে বিয়ের রফা করে ঘটক। কিন্তু কুলীনের মেয়েটি বৃদ্ধের দেওয়া পণ আর গয়না নিয়ে পালিয়ে যায়। উনিশ বছরের কুমারী মেয়ে অর্থে অরক্ষণীয়া, ব্রাহ্মণ যাকে বিয়ে করতে চেয়েছে কন্যাপণ দিয়ে অর্থাৎ তিনি অকুলীন ব্রাহ্মণ। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে অকুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে কুলীন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 127
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1018 - 1027
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু এ ছকটিও সে সময়ে ভেঙে গিয়েছিল। অর্থ এ ক্ষেত্রেও প্রধান নিয়ন্ত্রক। ব্রাহ্মণকে আখ্যানে মজুমদার বলা হয়েছে। ফলে সে ভূস্বামী শ্রেণির প্রতিনিধি। অর্থাৎ অর্থবান। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ঘটক বা কুলাচার্য্যরাই বিয়ের ব্যবস্থা করেছে।

দুই আখ্যানে ব্রাহ্মণরাই নিজেদের উপবর্ণ বা জাতি কাঠামোগত ছককে ভেঙে ফেলেছে। এভাবেই ৭ জুলাই প্রকাশিত একটি পত্রে (এটিও মূলত আখ্যান) দেখি এক ধনবান বাবুর মায়ের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে এক ভট্টাচার্য্য আশাবাদী হয়ে ওঠে। কেননা সে সময়ে বাবুরা মূলত পূজা-শ্রাদ্ধ-বিবাহ উপলক্ষে[১৫] ব্যাপক খরচ করত এবং সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বিদায় দিত পর্যাপ্ত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণের টোল থাকত তাদের অন্তত ২০০টাকা বিদায়ী বাঁধা থাকত। ওই ভট্টাচার্য্য আশাহত হয় যেহেতু মায়ের সুস্থতার লক্ষণ ফুটে ওঠে। কিন্তু আহার করতে তখনও পারছে না শুনে খুশি হয়। অর্থাৎ সে বাবুর মায়ের মৃত্যু কামনা করে যেহেতু তাতে তার বৈষয়িক লাভের সম্ভাবনা। পত্রের শেষে আছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের খোঁচা—

> "ভট্টাচার্য্যের কিন্তু এই গুণ যে দুই প্রহর হউক কিম্বা আড়াই প্রহর হউক অবাধে প্রাতঃস্নানটী আছে এবং কালে সন্ধ্যাটি করা আছে মিথ্যা কথাটী কন না নিন্দাও কাহারো করেন না।"[১৬]

এখানে ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত স্ব-বিরোধিতা স্পষ্ট। সমাজের কাছেও তাদের লোভের স্বরূপটি অজানা নয়। কিন্তু তখনও সমাজে তাঁদের আভিজাত্যের স্বরূপ একেবারে খসে যায়নি। তখনও অব্রাহ্মণ বাবুরা বিধান নিত তাদের থেকেই। ব্রাহ্মণ সেবা-ভোজন-বিদায়ী সকলই বিধানমাফিক চলছিল। আপাতভাবে কুলাচার্য্য বা কুলীনদের গৌরব থাকলেও ভিতরে ভিতরে তাদের নিজেদেরই অর্থলোভ, চাটুকারিতা তাদের আভিজাত্যের পতনকে সূচিত করে।

১৮৩০-এর পরবর্তীকালে কেবল জাতির অন্তর্গত স্ববিরোধিতা বা দ্বৈধতা নয় বরং তাদের দোষগুলিকে উল্লেখ করে জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গল হরকরা, ক্যালকাটা ক্যুরিয়র, রিফর্মার, সমাচার দর্পণ কলম ধরে। অন্যদিকে 'সমাচার চন্দ্রিকা' জাতিভেদ-রক্ষার জন্য শুধু সচেষ্টই থাকে না, উল্টে জাতিভেদের নতুন কাঠামোও তৈরি করতে চায়। 'সতীদ্বেষী'-দের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে নানা আপত্তি তোলে বা নাস্তিক ডিরোজিয়ানদের জাতিভ্রষ্ট বলে একঘরে করে রাখতে চায়। ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে বাঙালির চিন্তায় নানা দ্বান্দ্বিকতা তৈরি হয়। জাতিকাঠামোর গলদগুলিকে যুক্তির অস্ত্রে ভেঙে ফেলতে চায় ইউরোপীয় ও ইউরোপীয় জ্ঞানফল লাভ করা বাঙালিরা। কিন্তু যৌক্তিকতা প্রসারিত হয় তথাকথিত পুরানো জীবনাচারণে বিশ্বাসী মানসেও। এমনকি মহিলারাও নিজেদের বক্তব্যকে উন্মোচিত করেন।

প্রথমেই আঘাতের তীক্ষ্ণ খোঁচা নেমে এসেছে আভিজাত্যের চূড়ায় থাকা কৌলীন্য ব্যবস্থার উপরে। কৌলীন্য ব্যবস্থায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রী দুই সমাজের মধ্যেও একসময় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। মধ্যযুগে কুলীনদের মধ্যেও মেল, যূথ ও থাকের ভাগ ছিল। বিচিত্র ধরনের জাতিগত ভেদাভেদের ইতিহাসটি অদ্ভূত। ইসলাম পরবর্তী বাংলায় হিন্দু সমাজে যবন দোষ, রোহিলা দোষ, পাঠান দোষ, শূদ্র দোষ[১৭] ইত্যাদি দোষে জাতিভ্রষ্ট হওয়া ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তখন দেবীবর ঘটক 'মেলবন্ধন'[১৮] করে অল্প দোষে দুষ্ট কুলীনদের ছত্রিশ ভাগে ভাগ করেন (বাকিদের বংশজ ব্রাহ্মণ বলেছেন)। তিনি দোষগুলিকে 'গুণ' বলে চিহ্নিত করে এক এক দোষে 'মেল' তৈরি করেন। প্রতি মেলে দু'জনকে নিয়ে 'প্রকৃতি' ও 'পালটি' ব্যবস্থা তৈরি করেন। কেবল এই দুই মেলের মধ্যেই কুলকার্য্য সম্ভব ছিল।[১৯] মেলে মেলে কুলক্রিয়াকে যূথ বলা হত এবং মেল-অমেলের কূলক্রিয়াকে থাক বলা হত।[২০] ফলে জাতিভেদের ক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে কুলাচার্য্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[২১] কুলাচার রক্ষা করতে গিয়ে বিয়ের ক্ষেত্রে দেখা যেত এক পুরুষের বহু বিবাহ ঘটছে পালটি ঘর হিসেবে বা অন্যান্যদের জাতে উঠতে চাওয়ার জন্য অন্য জাতের কন্যাগ্রহণ করে। অন্যদিকে বংশজ বা শ্রোত্রিয়রা বিয়ের জন্য মেয়ে পেত না— উল্টে তাদের কন্যাপণ দিতে হত। যার পরিচয় উনিশ শতকের একটি ঘটনায় উপরে আমরা দেখিয়েছে। মনে রাখতে হবে ব্রাহ্মণদের মতো কায়স্থদেরও কৌলীন্যের ব্যবস্থা ছিল; তারাও উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বরেন্দ্রী—ভাগে বিভক্ত ছিল।

কৌলীন্যপ্রথা, বিয়ে ও মেয়েদের অধিকার—তিনটি বিষয় প্রবলভাবে জুড়ে ছিল। এই তিন বিষয় নিয়েই সে সময়ে প্রবল আলোড়ন তৈরি হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর সমাচার দর্পণ-এ প্রকাশিত একটি চিঠির বক্তব্যে দেখা যায় কৌলীন্যপ্রথার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 127
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1018 - 1027
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিকৃতির স্বরূপ নিয়ে বলা হয়েছে বল্লাল সেন কুলীনদের মধ্যেই আদান-প্রদানের বিধান দিলেও (যদিও এখানে সন্দেহ দেখিয়ে বলা হয়েছে 'আমরা অবগত নহি') বহুকাল থেকেই কুলীনেরা নিষ্কুলের মেয়ে গ্রহণ করছে। কুলীন জামাই হলে সে বংশের মর্যাদা বাড়ে। তাতে কুলীনেরা অনেক মূল্যের বিনিময়ে অকুলীনের মেয়ে বিয়ে করে এনেছে। তাতে সংখ্যায় ১০ থেকে ৫০ পর্যন্ত তারা বিয়ে করেছে। যদিও এ সংখ্যা একশো বা তার উপরেও উঠত।[২২] কুলীনরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিয়ে করত এবং নিজের স্ত্রীদের সঙ্গে প্রায় দেখাই করত না। তারা বাবার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে থাকত। যদিও মাঝে মাঝে দেখা করতে আসত তাও অর্থের বিনিময়ে। অন্যদিকে অকুলীন ব্রাহ্মণদের মেয়ে পাওয়া যেত না, পেলেও তাদের চার-পাঁচশো টাকায় কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে করতে হত। পত্রকার এর প্রতিকার চেয়ে বলেছে—

> "ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকের সুখ-বিরোধী এবং হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞাক্রমেতে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্ত্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে পারে।"[২৩]

পত্রিকাকার সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন। বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, ইংরেজ তা নিবৃত্ত করতেও পারে—এই তাঁর ধারণা।

এর দু'মাস পরে প্রকাশিত অন্য একটি চিঠিতে যোত্রহীন শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণদের দুরাবস্থা নিয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কুলীনদের জন্য ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও অকুলীন ব্রাহ্মণেরা বিয়ের জন্য মেয়ে পেত না। কেননা অকুলীনেরা কুলীন পাত্রে বিয়ে দিলে সেই কুলীনের ঔরসে জন্মান মেয়েকেও কুলীন পাত্রেই বিয়ে দিতে হয়। তাই—

> "পুরুষানুক্রমে তাঁহারদিগকে ঐ দাঁড়া বলবৎ রাখিতে যদি হয় ইহাতে কেহ আপন অসঙ্গতিপ্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণবশতঃ ত্রুটি করে তবে তাহাকে সকলে নিন্দা করেন এবং কুলাঙ্গার কহেন সুতরাং দশের নিন্দাভয়ে যোত্রহীনবিশিষ্ট বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা অন্য সহস্র ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উক্ত আপদের বোঝা ঘাড়ে করিয়া লয়েন।"[২৪]

যোত্রহীন ব্রাহ্মণদের একদিকে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল না, অন্যদিকে নিজেদের মেয়েদের তারা কুলীনের সঙ্গেই বিয়ে দিতে চাইত। ফলে তারা সর্বস্বান্ত হত। এরকমই কলকাতার কোনো এক সম্ভ্রান্ত লোক মেয়ের বিয়েতে একলক্ষ টাকা ব্যয় করে নিজের বাড়ি ও যাবতীয় দ্রব্য কুলীন জামাইয়ের হাতে দিয়ে দেশ ছেড়ে দেয়। ১৮৩০-এর কাছাকাছি সময়ে চুঁচুড়া নিবাসী বিশ্বম্ভর হালদারও এরকম করেছিলেন। তাছাড়া বরিশালের সাবর্ণ চৌধুরীরা, হুগলির ভট্টাচার্য পরিবার ইত্যাদির প্রমাণ দিয়ে বলা হয়েছে এরা সকলেই কুল রক্ষা করতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন। এরকম প্রমাণও পাওয়া যায় যে, বিয়ের পরে কুলীনরা নিজের স্ত্রীর শরীর থেকে সমস্ত গয়না, কাপড় খুলে নিয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু শুধু কুলরক্ষার দায়ে তার পরিবারের লোকজন কুলীনকে অর্থ দিয়ে বুঝিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। সরাসরি পরিবারের নাম উল্লেখে বোঝা যায় এরা নিশ্চয়ই প্রকাশ্যে কৌলীন্য ব্যবস্থার বিরোধী ছিল। তাই সকলেই কৌলীন্য প্রথাকে অশাস্ত্রীয় বোঝাতে চেয়ে বলেছে কুলীনদের নবগুণ তো নেইই, বরং তাদের 'নির্গুণ চূড়ামণি'ও বলা যায়। তাই পত্রকার দাবি করেছে আইনের মাধ্যমে কুলীনদের প্রাধান্য রোধ করে তাদের বাধ্য করা উচিত যাতে নিজের স্ত্রী-পুত্রের দায় তারা নেয়।

ওই মাসেই 'সম্বাদ কৌমুদী'-তে প্রকাশিত হয় অমুকী দেবী নামে এক চিঠি। এটিকেই উনিশ শতকে প্রকাশিত প্রথম মেয়েদের লেখা বলতে হয়। বেনামী এই চিঠিতে তিনি নিজের জীবনে কৌলীন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মা ও অন্যান্য চার মাসীর সঙ্গে কুলীন বাবার বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁর বাবার নিজস্ব কোনো বাড়ি ছিল না—প্রথমে মামা-দাদুর কাছে থেকেছেন, পরে নিজের বিভিন্ন শ্বশুরবাড়িতেই কিছু দিন করে কাটিয়েছেন। এই সূত্রেই তাঁর মায়ের ও মাসিদের এক এক মেয়ে হয়। তাঁদের যখন দশ বা বারো বছর বয়স তখন তাঁদের অন্যান্য বিমাতাদের ছেলেরা অর্থাৎ অচেনা দাদারা ও অচেনা মামার ছেলেরা তাদের বিয়ে ঠিক করে এক জেঠুর বয়সী কুলীনের সঙ্গে। তাঁদের বা তাঁর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 127
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1018 - 1027
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মা-মাসিদের কোনো সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই স্বামীকে তাঁরা তাঁদের পঞ্চাশ বছর বয়সেও আর স্বচক্ষে দেখেননি। পরে ওই মামার বাড়িতেই পাচিকা বা দাসী হিসেবে দিন কাটাচ্ছেন।

কৌলীন্যের মর্যাদা রক্ষা করতে বদ্ধ-পরিকর তাঁর দাদারা তাঁদের বিয়ে দেয়— কারণ না দিলে কৌলীন্য হারাবে তাদের পরিবার। তেরো বছর বয়সের আগে বিয়ে না দিলে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকার দায়ে পতিত হয়ে হত। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো অবকাশই সে সময়ে ছিল না। কোনো রকম আন্তরিক সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও বিমাতার মেয়েদের বিয়ে দেওয়াও দাদাদের কাছে কৌলীন্য রক্ষার দায় হিসেবেই বিবেচিত হত। সেক্ষেত্রে মেয়েদের বাড়তি দায় ছাড়া আর কিছু ভাবা হত না।

এক ব্যক্তির পক্ষে অনেক স্ত্রী-র মনের অভিলাষ পূরণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু কৌলীন্যের আভিজাত্য এমনই এক বয়ান যা সে সময়ে সমাজে বদ্ধমূল হয়ে ছিল। তাই কুলীনের গর্ব হ্রাস করতে নতুন আইন ব্যবস্থার জন্য দাবি উঠেছিল শুধু তাই নয়— চিন্তার বহুমাত্রিকতা এখানেই যে, একে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহু মতামত সে সময়ে বাঙালির বোধকে আলোড়িত করেছিল। যেমন - ১৮৩৫-এর ৪ঠা জুলাই দর্পণে মন্তব্য করা হয়—

> "কৌলীন্যের যে এক মর্য্যাদা তাহার হানি না হয় মেলবদ্ধ না থাকে অর্থাৎ কুলীনের কন্যা কুলীনে বিবাহ করিতে আপত্তি না থাকে অর্থাৎ পরস্পরে পরস্পরের কন্যা বিবাহ করিতে অর্থ ব্যয় না হয় আর কন্যা বিক্রয় না হয়।"[২৫]

এই বক্তব্য পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে আলাদা। যখন শ্রোত্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মণদের সপক্ষে কথা বলা হয়েছে তখন কৌলীন্যকেই বিনষ্ট করার কথা ভেবেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে মেলবন্ধের কারণে এক মেলের কুলীন অন্য মেলের কুলীন মেয়েকেও যে গ্রহণ করতে পারত না তার বিরুদ্ধেই আপত্তি তোলা হয়েছে। রাঢ়ীয়ের মেলবন্ধ থাকায় যে অমঙ্গল তৈরি হচ্ছে তা বারেন্দ্র সমাজে হয় না—এ কথা এখানে সরাসরিই বলা হয়েছে। ফলে মেলবন্ধ নীতি তুলে দেওয়ার জন্য সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে —

> "যদ্যপি শ্রীলশ্রীযুক্ত এই বিষয়ে দৃক্‌পাত করিয়া সৎকুল ও বংশ রক্ষা করেন তবে যদবধি এই হিন্দুত্ব থাকিবেক তদবধি এই কীর্ত্তির ঘোষণা থাকিবেক নতুবা ধর্ম্মক্ষয় ও বংশ ধ্বংস ও কুলক্ষয়ের যে হেতু তা কেবল দেশাধিপতির অমনোযোগই জানিব।"[২৬]

বংশ, কুল, হিন্দুত্ব রক্ষা সবই করার প্রসঙ্গ উঠলেও তা অন্যের সমস্যার কারণ যেখানে সেখানে নিয়ম বাদলাতে চাওয়ার কথা উঠেছে। এর সঙ্গেই মেয়ের বাবাদের পাত্র বাছা নিয়েও আপত্তি তোলা হয়েছে। শাস্ত্রবাক্য তুলে প্রমাণ করা হয়েছে— পাত্রের ছয় গুণ থাকা দরকার (নাতিদূরে সমাপেচ নাচার্য্যে নচ দুর্ব্বলে বৃত্তিহীনেচ মূর্খেচ), কিন্তু বাবারা কেবল অর্থ দেখেই বিয়ে দিচ্ছে—যাতে শাস্ত্রীয় আদেশকে লঙ্ঘিত হত। কেননা— "তদ্দেশম্ পতিতংমন্যে যদ্দেশে শুক্রবিক্রয়ী" (শুক্রবিক্রয়ী অর্থে যারা নিজের ঔরসজাত ছেলে বা মেয়েকে বিক্রি করে)। সেই দেশ পতিত। ফলে সে সময়ে বাবারা পতিতের মতো কাজ করতেন। যা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। শাস্ত্র প্রমাণ দিয়ে সে সময়ে অনেকেই বোঝাতে চেয়েছেন বল্লালী প্রথায় নির্বাচিত নবগুণ তখন কুলীনদের ছিল না—অন্যদিকে অকুলীন ব্রাহ্মণদের সে গুণ খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে শাস্ত্রের সব কিছুই সে সময়ে মান্য হতে পারে না। প্রাচীন স্মৃতির প্রমাণে বাংলার অর্বাচীন স্মৃতির ত্রুটিগুলিকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। এই পদ্ধতি রামমোহনও ব্যবহার করেছিলেন। সে বিষয়ে যথার্থ শাস্ত্র বচন বির্বাচনের ধরনটি তারা নির্দিষ্ট না করলেও বোঝা যায় সেখানে মনু-পরাশর-যাজ্ঞবল্ক্য যতখানি তাদের কাছে মান্য ততখানি শ্রীধর-রঘুনন্দন নন। তবুও সব বিষয়ে তারা একমত নন। যেমন পাবনা জেলার কোনো এক দর্পণ পাঠক কৌলীন্যের আভিজাত্যে প্রশ্ন তুলে বলেছেন—

> "গবর্‌নর্ জেনরেল বাহাদুর এমত কোন নয়ম নির্দ্ধার্য্য করেন যে কোন ব্রাহ্মণ কন্যা ক্রয় বিক্রয় করিতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এক বিবাহের অধিক করিতে না পারেন।"[২৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 127
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1018 - 1027
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জাতি কাঠামো বদল করতে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা বা সে বিষয়ে আন্দোলন তৈরি করার চেষ্টা রামমোহনের সতীদাহ আন্দোলনের সফলতার পরে উত্তরকালের আশাকে দ্যোতিত করে।

কৌলীন্য ব্যবস্থায় মেয়েদের ব্যভিচার প্রবণতা, জারজ সন্তানের উৎপত্তি, ভ্রূণ হত্যা, বৈধব্য যন্ত্রণা সবই জুড়ে গিয়েছিল। তার নিকট ফল কন্যা ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম। ১৭-ই জুন ১৮৩৭-এ জ্ঞানান্বেষণ-এ জাতিভেদ নিয়ে একশ্রেণির বাঙালির অহঙ্কারকে সমূলে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে চারটি বাস্তব দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে। বংশজ ব্রাহ্মণেরা যথারীতি বিয়ের জন্য মেয়ে পেত না— যেহেতু মর্যাদা রক্ষার দায়ে তাদের কুলের মেয়েদের কুলীনদের সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া হত। ফলে তারা মেয়ে কিনে বিয়ে করত। এর দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছে। বংশজরা বিয়ের জন্য অন্য জাতির মেয়েই শুধু নয়, মুসলিম মেয়েদেরও বিয়ে করত। এটা শুধু বংশজদের ক্ষেত্রেই নয় কুলীনদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। এ বিষয়ে কুল রক্ষার পাহারাদার কুলাচার্যরাও অর্থের বিনিময়ে সাহায্য করেছিল।

দুই ব্রাহ্মণ বর্ধমান থেকে ফিরছিল। রাস্তায় সুন্দরী এক মেয়ে দেখে তাকে ছয় টাকা দিয়ে কিনে নেয় এক মুসলমানের কাছ থেকে। পরে এক বিপত্নীক ব্রাহ্মণের কাছে তাকে চারশো টাকায় বিক্রি করে দেয়। কিন্তু মেয়েটির আসল পরিচয় বেরিয়ে আসে একদিন। এরকমই কলকাতার কোনো এক মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণী উপপত্নীর মেয়েকে বিয়ে করে—ব্রাহ্মণ মেয়ে বিয়ে করছে ভেবে। কিন্তু সে মেয়ে সাহেবের ঔরসজাত। অন্যদিকে ওই ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠী ছিল। ফলে ব্রাহ্মণের স্ত্রীর হাতে খাওয়া যজমান-শিষ্য-জ্ঞাতি সবাই এককালে জাতিভ্রষ্ট হওয়ার কথা। কাজলাপাড়া বা ভাটপাড়াতেও এরকম কুলাচার্যদের কেনা মালাকার, পোদ্দার ইত্যাদির সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিয়ে দিয়েছে। শেষে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে—

> "আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি ভারি পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান বাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন।"[২৮]

এ অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। এর প্রতিবাদী কোনো স্বর শোনা না যাওয়ায় এর যাথার্য্য সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত হওয়া যায়। নানা বিষয়েই কৌলীন্য ব্যবস্থার অর্বাচীন প্রক্ষেপ সম্পর্কে প্রমাণ যেটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে তা প্রাচীন স্মৃতি, তন্ত্র বা পুরাণ থেকেই। সর্বোপরি জাতি কাঠামোর ভিত আলগা হওয়ার বা সে নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার একটা বড়ো কারণই ছিল অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার গরমিল ও কৌলিকবৃত্তি ত্যাগ।

Reference:

১. Kane, Pandurang Vaman; History of Dharmasastra (Ancient and Mediavel Religious and Civil Law), Vol. II, Part I., Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1941, p. 54-55

২. সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, 'বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি', জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও দাশগুপ্ত, অভিজিৎ; আই সি বি এস, নয়া উদ্যোগ, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ২৭

রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, দে'জ, কলকাতা, ১৪২৯, পৃ. ৩৪৪

৩. সান্যাল হিতেশরঞ্জন, 'বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি', জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর দাশগুপ্ত অভিজিৎ, আই সি বি এস, কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ২০২২, পৃ. ২৯

৪. কুলীনেরা মুখ্য-গৌণ হিসেবে ও শ্রোত্রিয়রাও 'সিদ্ধ' ও 'সাধ্য'-র হিসেবে দুইভাগে বিভক্ত ছিল। গৌণ-কুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয়েরা বীরাচারি তন্ত্র-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ছিল।

বসু, নগেন্দ্রনাথ; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ), কলিকাতা : বিশ্বকোষ কুটীর, ১৩৩৪, পৃ. ৩৪

৪. এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন মনে করেছেন— "সমাজ যতদিন পর্যন্ত ব্যাবসা-বাণিজ্যপ্রধান ছিল, যতদিন অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যই ছিল সামাজিক ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় ততদিন পর্যন্ত বর্ণস্তর হিসাবে না হউক, অন্তত রাষ্ট্রে এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 127
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1018 - 1027
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সামাজিক মর্যাদায় বণিক-ব্যাবসায়ীদের বেশ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে বাঙালীর সমাজ প্রধানত কৃষি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্পনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই অর্থোৎপাদক ও শ্রমিকশ্রেণীগুলি ক্রমশ সামাজিক মর্যাদাও হারাইতে আরম্ভ করে।" রায়, নীহারঞ্জন; বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪২৯, পৃ. ৩৪৪

৫. বসু, নগেন্দ্রনাথ; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস কায়স্থ-কাণ্ড, কলিকাতা : বিশ্বকোষ কুটীর, ১৯৩৭, পৃ. ৬

৭. প্রাচীনকাল থেকেই এরা জমির সত্ত্বও ভোগ করত।

৮. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার; বাংলার আর্থিক ইতিহাস ঊনবিংশ শতাব্দী, কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১০, পৃ. ২

৯. ব্রাহ্মণেরা আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক থেকে ভূমিজীবী ইত্যাদি নানা পেশা গ্রহণ করেছিলেন। মনে করা হয়, পাচক বৃত্তি গ্রহণের কারণ ব্রাহ্মণদের অন্ন সকল জাতিই গ্রহণ করতে পারত— এই নিয়ম পাচক ব্রাহ্মণদের সুবিধা করে দিয়েছিল। মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ; জাতিভেদপ্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ, কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৯৮১, পৃ. ১৯

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারেশ্বর; দেবগণের অভিনব-ভারত-দর্শন (বর্ত্তমান-সমাজ-চিত্র), কলিকাতা : ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ১৩২০, পৃ. ১৭২

১১. বল্লাল সেন কৌলীন্য ব্যবস্থা চালু করেছিলেন বলে মনে করা হলেও ঐতিহাসিকদের মতে এই ব্যবস্থা বাংলায় অনেক আগে থেকেই চালু ছিল।

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (সংকলক ও সম্পাদক); সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০, কলিকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মাঘ ১৪২৫, পৃ. ১০৮

১৩. কুলাচার্য্যরাই সেকালে কুলজিগ্রন্থগুলির রচয়িতা, সংরক্ষক ছিলেন। তাঁরা সমাজের আভিজাত্য রক্ষা করতে কোনো পরিবারের/জাতির ব্যবহারিক ত্রুটিতে তাদের জাতিভ্রষ্ট করার কথা লিপিবদ্ধ করত। অভিজাত পরিবার কখনও চাইত না তাদের জাতি নষ্ট হোক। এতে কুলাচার্য্যরা সন্ত্রাস বজায় রাখতে পারত। জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিধানকর্তা হিসেবেও তাদের প্রাধান্য ছিল।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (সংকলক ও সম্পাদক); সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০, কলিকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মাঘ ১৪২৫, পৃ. ১০৮

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮

১৬). পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

১৭. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর তথ্যকে ভিত্তি করে জানিয়েছেন— "কোন্ এক মুসলমান সিপাহী ব্রাহ্মণকে ঘুসি মেরেছে, তাতে তার জাত নষ্ট হয়ে গেল। মুসলমানের খানার ঘ্রাণ কোন ব্রাহ্মণের নাকে ঢুকলো তো অমনি 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্' বলে তার জাতিপাত হল।"

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ; বাঙ্গালার ইতিহাস, কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ফাল্গুন ১৩৮৩, পৃ. ১৫৭

কুলজী গ্রন্থগুলোয় এর আরো প্রমাণ আছে। 'দোষমালা' নামক গ্রন্থে আছে শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক কুলীনের অবিবাহিত মেয়েকে হাঁসাই খাঁ নমক এক খানাদার ধর্ষণ করলে শ্রীনাথকে জাতিচ্যুত করা হয়।

পূততুণ্ড শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র, কৌলীন্যপ্রথা, বরিশাল : বরিশাল—আদর্শ যন্ত্র, ১৩১৪, পৃ. ৪২

১৮. চৈতন্যজন্মের মোটামুটি পঞ্চাশ বছর আগে এই ব্যবস্থা চালু করেন দেবীবর।

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র; কৃত্তিবাস পণ্ডিত, সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৪ সন, পৃ. ১৩৩

১৯. সরকার, প্রফুল্লকুমার; ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু, কলিকাতা : আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, অক্টোবর ১৯৪৫, পৃ. ৩৩

২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র; কৃত্তিবাস পণ্ডিত, সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৪ সন, পৃ. ১৩৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 127
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1018 - 1027
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২১. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জাতিপাতের কারণটি ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন— "মুসলমান যুগে ব্রাহ্মণেরা মুসলমান রাজাদের অর্থ নিয়ে লোকের জাতিপাত করতো।"
দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ; বাঙ্গালার ইতিহাস, কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৩, পৃ. ১৫৭
২২. সমাচার দর্পণে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখতে পাই বালি গ্রামের গোবিন্দচন্দ্র নামক এক কুলীনের একশো স্ত্রী ছিল।
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪২৫, পৃ. ২৫৪
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০
২৬. পূর্বোক্ত
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬